শিক্ষার মান বনাম শিক্ষকের মেধা

ইউসুফ শরীফ

জনৈক পত্র লেখক পত্রিকান্তরে বেসরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের বেতন বৈষম্যের কথা তুলে ধরেছেন। বলেছেন, নর্মাল মাস্টার্স তো দূরের কথা অনার্সসহ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাস্টার্স ডিগ্রীকেও হার মানতে হয় নর্মাল বিএবিএড ডিগ্রীর কাছে।.....মাধ্যমিক স্কুলে যদি অনার্সসহ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাস্টার্স ডিগ্রীধারী কেহ শিক্ষক হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন, তবে তিনি বেতন পান মাত্র ২৫৫০/- টাকা স্কেলে। কিন্তু বিএডসহ সাধারণ বিএ পাস শিক্ষক বেতন পান ৩,৪০০/- টাকা স্কেলে। তিনি এও উল্লেখ করেছেন যে, সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের যোগ্যতা চাওয়া হয় বিএবিএড অথবা মাস্টার্স। এ ক্ষেত্রে বিএবিএডকে নর্মাল মাস্টার্সের সমতুল্য ধরা হয়ে থাকে। বিষয়টি হয়তো অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবে না। তবে, স্কুলগুলোতে শিক্ষার মান সাধারণভাবে নিচে নেমে যাচ্ছে, শিক্ষকরা আগেকার দিনের মতো ক্লাসে মনোযোগ দিয়ে পড়ান না। আর এর ফলে ছাত্রছাত্রীরা যোগ্য, দক্ষ, উপযুক্ত নাগরিক হয়ে গড়ে ওঠতে পারছে না এবং আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে অভিভাবকদেরও। জাতীয় পর্যায়েও এই ক্ষয়ক্ষতি বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে। এসব কথা অহরহ শোনা যাচ্ছে এবং কথাগুলো সত্যও বটে। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে দেখা যাবে, অধিকাংশ শিক্ষকই এখন ক্লাসে হয় মনোযোগ দিয়ে পড়াতে আগ্রহী নন, না হয় পড়াতে পুরোপুরি সক্ষম নন। বিশেষ করে, বেসরকারী শিক্ষালয়গুলোতে এটা লক্ষ্যণীয় হয়ে ওঠছে। প্রথমোক্তরা অর্থের লোভে স্কুলে ছাত্রছাত্রী পড়ানোর চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব দেন প্রাইভেট পড়াতে। কেউ বাসায় পড়ান ছাত্রছাত্রীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে এবং কেউ আবার পরোক্ষভাবে বড় বড় কোচিং সেন্টারের সঙ্গে যুক্ত। এগুলো স্কুলের মতোই জমজমাট চলছে। এ যেন বিকল্প স্কুল। বাস্তব অবস্থাদৃষ্টে সহজেই অনুমিত হয়, অচিরেই প্রচলিত স্কুলগুলোতে তালা লাগছে এবং কোচিং সেন্টারগুলো স্কুলের স্থান দখল করবে। রাজধানী থেকে শুরু করে মফঃস্বল শহর এবং এমনকি, গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত এই কোচিং সেন্টার এমন ' জাঁকিয়ে বসেছে যে, আর্জ আর এগুলোর বৈধতা নিয়ে কারো মনে কোনো প্রশ্ন জাগে না। স্কুল থাকতে কোচিং সেন্টার কেন— এই সহজ অনিবার্য প্রশ্নটির কথাও কারো মনে যারা নিজের বাড়িতে বসেই ভাল শিক্ষকদের কাছে পড়তে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সক্ষম তাদের কথা আলাদা। মোদ্দা কথা দাঁড়াচ্ছে, শিক্ষকদের ব্যাজ করে পড়ানো এবং কোচিং সেন্টারে পড়ানো এক ধরনের অঘোষিত বৈধতা পেয়ে গেছে ইতোমধ্যে। শিক্ষকদের প্রাইভেট পড়ানো এবং কোচিং সেন্টারের ব্যবসার বিরুদ্ধে এদেশে যথেষ্ট কথাবার্তা হয়েছে। কিন্তু, সরকার কখনো এগুলো বন্ধের কোনো উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন ওঠে, তাহলে কি সরকার এগুলোকে প্রয়োজনীয় ও বৈধ মনে করেন? প্রথমতঃ যদি বৈধ ও প্রয়োজনীয় মনে করেন; তাহলে, দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রেস নোট জারি করে একথাটি জনগণকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয়া সরকারের দায়িত্ব। বলা বাহুল্য এ দায়িত্বটি সরকার এখনও পালন করেননি। দ্বিতীয়তঃ প্রচলিত স্কুলিং সিস্টেম বন্ধ করে না দেয়ারওতো তাহলে কোনো যুক্তি নেই। এ যৌক্তিক কাজটিও এযাবত করা হচ্ছে না; অর্থাৎ প্রচলিত স্কুলগুলো বন্ধ করা হচ্ছে না।

যহোক, এতে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে অন্য কথায়, ভাবিষ্যত নাগরিকদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার ব্যাপারে জাতীয় পর্যায়ে উদাসীনতা ও ব্যর্থতার বিষয়টি এখন আর মোটেই অস্পষ্ট নয়। স্কুলে ক্লাসে কেন ভাল পড়াশোনা হয় না, তার দ্বিতীয় কারণটি নিয়েও আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়। শিক্ষকদের একাংশ এই পেশাকে অর্থ বানানোর মোক্ষম মাধ্যম হিসেবে যে গণ্য করেছেন— এটা আর নতুন কথা নয়। এক সময় এদেশে চিকিৎসা পেশা ছিল অর্থ কামানোর মেশিন বিশেষ। তারপর এরকম আরেকটি পেশা হিসেবে গণ্য হয় ইঞ্জিনিয়ারিং পেশা। আর এখন এমন পেশা হল শিক্ষকতা। যদি এই এটাতো কোনো সুস্থ কথা হতে পারে না। যাহোক, স্কুলে পড়াশোনা হওয়ার অপর কারণটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। অর্থাৎ যেসব শিক্ষক ক্লাসে ভাল করে পড়াতে সক্ষম নন, তাদের বিষয়টিও কখনো পর্যালোচনা করে দেখা হয়নি। তিরিশ চল্লিশ বছর আগেও এদেশে এমন নজির অহরহই দেখা গেছে যে, মেধাবী ছাত্রটি মাস্টার্স ডিগ্রী নিয়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে গ্রামে ফিরে এসে গ্রামের হাই স্কুলটিতে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত হয়েছেন। আজকাল কি এমন নজির দেখা যায়? মাস্টার্সে ১ম ক্লাস পাওয়া কোনো মেধাবী ছাত্র কি গ্রামে নয়, ৩য় কোনো হাই স্কুলে শিক্ষকতা পেশায় নিজেকে যুক্ত ক এক কথায় জবাব দেয়া যায়, করেন না। কারণ, শিক্ষকতা মোটেই আকর্ষণীয় পেশা বলে গণ্য হয়নি। বেসরকারী স্কুলেতো নয়-ই, সরকারী স্কুলেও শিক্ষক হিসেবে জীবন কাটানোর কথা মেধাবী ছাত্ররা এখনো ভাবেন না। শিক্ষকদের বেতন-ভাতা আগের তুলনায় বাড়লেও তা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠেনি। ফলে; সাধারণভাবে দেখা যায়, অপেক্ষাকৃত কম মেধাবীরাই বাধ্য হয়ে শিক্ষকতা পেশায় আসেন। শিক্ষকতার সরল অর্থ শিক্ষা দান করা। শিক্ষা দানের কাজটি যাকে করতে হয়, তাকে কম মেধাবী, কম পরিশ্রমী, কম দক্ষ হলে চলে না। কাজেই, শিক্ষকতা এমন একটি পেশা যেখানে সর্বাধিক মেধাবী পরিশ্রমী ও দক্ষরাই ভাল করতে পারেন। সরকার বিভিন্ন সময়ে শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। একুশ শতকের উপযোগী ও আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষায় ভবিষ্যত নাগরিকদের শিক্ষিত করে তোলার আশাবাদও সরকারী পর্যায় থেকে ব্যক্ত করা হচ্ছে। খুবই সময়োপযোগী ও ছুটেছেন এবং যারা ছাত্রছাত্রীদের পাঠদানে অক্ষম—তারা দেবেন? এ প্রশ্ন সরকারের মনে জেগেছে বলে মনে করার কোনো কারণতো দেখা যাচ্ছে না। লেখার শুরুতে জনৈক পত্রলেখকের যে কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাতে যথেষ্ট স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে যে, বেসরকারী স্কুলগুলোতে শিক্ষকদের বেতন বৈষম্য রয়েছে। বেতন বৈষম্য রয়েছে সরকারী-বেসরকারী স্কুলের শিক্ষকদের মধ্যেও। এছাড়া, শিক্ষকদের বর্তমান প্রারম্ভিক যে বেতন ভাতা তা-ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাল ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষকতা পেশায় আকর্ষণের জন্য যথেষ্ট নয়।

বেতন-ভাতা বৃদ্ধির বেলায় সরকার সব সময়ই রক্ষণশীল। অর্থনৈতিক বাস্তবতার কারণেই এরকমটি হয়ে থাকে। তবে, যেখানে জাতির ভবিষ্যত অর্থাৎ ভবিষ্যৎ নাগরিকদের উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার প্রশ্ন সেখানে এধরনের রক্ষণশীলতা অবশ্য বর্জনীয়। শিক্ষকদের উচ্চতর প্রারম্ভিক বেতন নির্ধারণের বিষয়টি তা-ই প্রথম বিবেচনা হওয়া উচিত। প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এবং এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন-ভাতার মধ্যকার বর্তমান পার্থক্য যত দ্রুত, যত বেশি হ্রাস করা যায় দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য ততই মঙ্গল। আমরা বলবো, এক্ষেত্রে পার্থক্যটা নামমাত্র হওয়াই সব দিকের বিবেচনায় বাঞ্ছনীয়। কারণ, এই চার শ্রেণীর শিক্ষকের মধ্যে পেশাগত দিক দিয়ে অর্থাৎ কর্ম প্রকৃতির দিক দিয়ে প্রকৃতপক্ষে কোনো পার্থক্য নেই। আর বেতন বৈষম্যের বর্তমান অবস্থাটা দূর করতে পারলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া মেধাবী ছাত্রটি বিনা দ্বিধায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে যোগ দিতে পারবেন। আমাদের মনে রাখা দরকার মেধাবী শিক্ষকদের দ্বারাই আগামী শতকের আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষাদান সম্ভব। দ্বিতীয়তঃ নিচের দিকে শিক্ষার ভিত্তিভূমির মানোন্নয়ন ঘটাতে না পারলে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে যত মেধাবী শিক্ষকই নিয়োগ করা হোক তাতে শিক্ষার মানোন্নয়ন সম্ভব হবে না। বহির্বিশ্বে উন্নত দেশগুলোর শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে তাকালেই এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কম শিক্ষিত শিক্ষক এবং কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশি শিক্ষিত শিক্ষক নিয়োগ করার পরিবর্তে প্রাথমিক থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ

তারিখ APR 1 1999
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬